অজানা পার্শেলের রহস্য

শ্রীস্বপন কুমার

সি.আই. ডি. সিরিজ—৯নং

অজানা পার্সেলের রহস্য

শ্রীস্বপনকুমার

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০০০১

মুদ্রণ]

মূল্য ঃ দুই টাকা

রহস্য ও রোমাঞ্চ সাহিত্যের যাদুকর

শ্রীঅপনকুমার রচিত

[পাতায় পাতায় শিহরণ, রোমাঞ্চ ও শ্বাস-রুদ্ধকারী আতঙ্ক। পড়তে পড়তে ভয়ে আঁতকে উঠবেন। শেষ পাতা পর্যন্ত এক-নিঃশ্বাসে না পড়ে ছাড়তে পারবেন না। রহস্য উপন্যাস জগতের অভিনব বিস্ময়।]

সি. আই. ডি. সিরিজ

১। ছত্রপতির তলোয়ার
২। অপরাধী সম্রাট
৩। দস্যুরাজের ষড়যন্ত্র
৪। প্রাণ নিয়ে খেলা
৫। মিস্ট্রি গার্ল
৬। আঁধার রাতের যাত্রী
৭। গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব
৮। হীরার লকেটের রহস্য
৯। অজানা পার্সেলের রহস্য
১০। নীল সাগরের আতঙ্ক

কালনাগিনী সিরিজ

১। দস্যু-নেত্রী কালনাগিনী
২। কালনাগিনীর অভিযান
৩। কালনাগিনীর বিভীষিকা
৪। কালনাগিনীর মারণ-উৎসব
৫। সবুজ-দ্বীপে কালনাগিনী
৬। মৃত্যুচক্রে কালনাগিনী
৭। কালনাগিনীর রহস্যজাল
৮। কালনাগিনীর ষড়যন্ত্র
৯। কালনাগিনীর প্রতিহিংসা
১০। চীন-সীমান্তে কালনাগিনী
১১। সাগরতলে কালনাগিনী
১২। ফাঁসির মঞ্চে কালনাগিনী
১৩। কালনাগিনীর রণ-হুঙ্কার
১৪। আর্ত-ত্রাণে কালনাগিনী
১৫। কালনাগিনী ও দস্যু মোহন
১৬। দিগ্বিজয়ী কালনাগিনী
১৭। মহাশূন্যে কালনাগিনী
১৮। আন্দামানে কালনাগিনী
১৯। মায়াবিনী কালনাগিনী
২০। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে কালনাগিনী

এর পরে আরও বের হচ্ছে।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

॥ এক ॥

হরেন সামন্তর কোম্পানীটি যদিও বিখ্যাত তবু তাদের মূলধন তত বিরাট নয়।

বিভিন্ন মেসিনারী পার্টস্ তারা তৈরি করে। নানা জায়গায় তারা তাদের মালপত্র সাপ্লাই করে।

তাছাড়া বিদেশ থেকেও কিছু কিছু মালপত্র তারা আমদানি করে থাকে। সেই সব মালপত্র তারা কিছু বেশী মূল্যে বিক্রি করে ভারতের নানা স্থানে।

তাদের কোম্পানীর মালপত্র খাঁটি ও বেশ কার্যকরী বলে তাদের খ্যাতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

হরেন সামন্ত বেশ সাধু ও সৎ প্রকৃতির ব্যবসায়ী বলে সারা ভারতে বিখ্যাত। তাই তাদের মূলধন যদিও বিরাট অংকের নয়, তবুও খ্যাতি তার চেয়ে অনেক বেশী।

সেদিন বেলা এগারোটা।

হরেনবাবু তাঁর একজন কর্মচারীকে ডাকলেন। তার নাম রাজেন। তিনি বললেন—রাজেনবাবু, ওয়েষ্টার্ন স্থইপ্ কোম্পানীর পার্সেলটা এসেছে?

—হ্যাঁ, স্যার।

—কখন এলো?

—কাল সন্ধ্যায়।

—আপনি নিয়ে এসেছেন ত?

—হ্যাঁ।

—ওতে গোটা কুড়ি বেশ প্রয়োজনীয় পার্টস্ আছে। সেগুলোর খুব চাহিদা এখানে।

—তা ত জানি।

—আপনি ওটা নিয়ে আসুন ত। দেখি কি ধরনের মাল দিয়েছে ওরা।

—আচ্ছা স্যার!

রাজেন চলে গেল।

একটু পরেই রাজেন ফিরল হাতে পার্সেলটা নিয়ে। বললে—আপনি এটা দেখুন স্যার।

—হ্যাঁ, দেখছি। আপনি এবার ফেয়ারলি ব্রাদার্সের চিঠিটা ড্রাফ্ট করে ফেলুন।

—আচ্ছা স্যার।

—আমি এখন ব্যস্ত থাকব। আধঘণ্টা পরে আপনি এসে চিঠিটা আমাকে দেখাবেন।

—ঠিক আছে।

রাজেন বেরিয়ে গেল।

হরেনবাবু মন দিলেন পার্সেলটির দিকে। দেখলেন ঠিক জায়গা থেকেই এসেছে। মালগুলি ফরেন কোম্পানী থেকে এসেছে—এগুলির দাম প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকা পড়েছে।

পার্সেলটা ধীরে ধীরে খুলে ফেললেন হরেনবাবু।

কিন্তু খুলেই দেখেন ভেতরে মালপত্র কিছু নেই, কয়েক বাণ্ডিল কাগজ। এত কাগজ কিসের?

ভাল করে ডালাটা ফাঁক করে হরেনবাবু সেগুলো টেনে বের করে আনেন।

এনেই তিনি যা দেখেন, তাতে যেন স্তম্ভিত হয়ে যান একেবারে।

দেখেন বাক্স বোঝাই শুধু কারেন্সী নোটের বাণ্ডিল রয়েছে।

আর সে নোট ভারতীয় নোট নয়—সব হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের নোট অর্থাৎ বিদেশী নোট।

হরেনবাবু সেগুলো গুনে দেখলেন।

দেখেন সব মিলে তাতে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার সমান মূল্যের পাউণ্ডের নোট আছে।

হরেনবাবু বিস্ময়ে স্তব্ধ।

এত টাকার নোট তারা এভাবে তাঁর কাছে পাঠাল কেন? আর তাঁর সব মালপত্রই বা কোথায় গেল? সেগুলো এলো না কেন? তার বদলে চার হাজার টাকার মালের বাক্সে এলো বিশ লক্ষ টাকার কারেন্সী নোট?

একি রহস্য—না, প্রহেলিকা?

কি করে এমন ঘটনা ঘটতে পারে তা হরেনবাবুর মাথায় এলো না।

কলিং বেল টিপলেন তিনি।

ক্রিং ক্রিং—

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল তাঁর কর্মচারী রাজেন।

—ডেকেছেন স্যার?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার?

—জরুরী প্রয়োজন আছে।

—কেন স্যার?

—এ পার্সেলটাতে আমাদের মাল আসেনি।

—আসেনি?

—না।

—তবে এতে কি এসেছে?

—এই দেখুন।

থলিগুলি রাখলেন হরেনবাবু রাজেনের সামনে।

অবাক হয়ে দেখল রাজেন।

সব বাণ্ডিল বাণ্ডিল কারেন্সী নোট। একশো পাউণ্ড ও দশ পাউণ্ডের নোট।

—এ ত পাউণ্ডের নোট?

—হ্যাঁ। মোট দু হাজার পাউণ্ড আছে। মানে বিশ লক্ষ টাকা। হঠাৎ এখানে কি করে এলো জানি না। তাছাড়া এই কোম্পানীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? চার হাজার টাকার মালের বদলে বিশ লক্ষ টাকার কারেন্সী নোট!

—তাই ত!

—আপনি এক কাজ করুন এক্ষুণি।

—বলুন স্যার।

—এদের চিঠি লিখে দিন যে আমাদের মাল আসেনি। তার বদলে বিশ লক্ষ টাকার মত মূল্যের বিদেশী নোট এসেছে। এদেশের এজেণ্টদের মাধ্যমে ওরা যেন টাকাটা ফেরৎ নিয়ে মালটা পাঠায়।

—একটা কথা স্যার—

—বলুন।

—এতগুলো টাকা দিয়ে দেবেন?

—নিশ্চয়। আমাদের কোম্পানীর সুনাম বিশ লক্ষ টাকার চেয়ে অনেক বেশী।

—তা বটে।

—ওদের লিখে দিন, আমাদের সঙ্গে এধরনের ব্যবহার করার অর্থ কি?

—আচ্ছা স্যার।

রাজেন বেরিয়ে গেল চিঠি ড্রাফ্‌ট করতে। আর হরেনবাবু বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

* * *

পরদিন সকাল।

হরেনবাবু একটা আশ্চর্য চিঠি পেলেন।

মাননীয় হরেনবাবু,

আপনার নামে গতকাল বিদেশ থেকে একটা পার্সেল এসেছে।

পার্সেলটা অন্যত্র যেতো—ভুল করে আপনাদের ঠিকানায় গেছে।

আমরা সম্প্রতি তা জানলাম। আমরা একটি ইণ্টার-ন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল দল। ঐ টাকাটা আমাদের সম্পত্তি।

কি ভাবে কেন টাকাটা এভাবে গেল তা আপনার জানার দরকার নেই।

আমরা চাই, আপনি ঐ টাকাগুলো আমাদের হাতে দিয়ে দেবেন। আপনার চার হাজার টাকার থলি খোয়া গেছে। তার বদলে দশ হাজার টাকা আমরা আপনাকে দেবো ক্ষতিপূরণ বাবদ।

যদি এতে আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে আমাদের কথায় সম্মতি জানাবেন।

আর আপনি যদি ওটা আমাদের দিতে সম্মত না হন, তাহলে ভয়াবহ বিপদে পড়বেন, এ কথাটা মনে রাখবেন।

ইতি—

দলপতি, অপরাধী সংঘ।

চিঠিটা পড়ে হরেনবাবু হাসলেন।

ভাবলেন এসব কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে একের পর এক? আর তিনি কি করে এই সব ঘটনাচক্র থেকে মুক্তি পাবেন?

কিছুই ভেবে পান না হরেনবাবু।

তিনি তখন ভাবলেন, এই সব টাকা তিনি ভারত সরকারকে জমা দেবেন সব কথা জানিয়ে। অপরাধী সংঘের কথায় তিনি ভয় পাবেন না।

যখন এই সব কথা ভাবছেন তখন ঘন-ঘন টেলিফোন বেজে উঠল।

ফোন ধরলেন হরেনবাবু।

—হ্যালো···কে ?

—আমি অপরাধী সংঘ থেকে কথা বলছি।

—বুঝেছি। কি চান আপনারা ?

—ঐ টাকাগুলো।

—মাপ করবেন। ঐ টাকা আমি চাই না—আর তা আপনাদেরও দেব না। কারণ কোম্পানীকে আমি এর মধ্যেই চিঠি লিখে সব জানিয়েছি। আমি ঐ টাকা ভারত সরকারকে জমা দেব। তারা যা হয় ব্যবস্থা করবে।

—ঐ কোম্পানীর টাকা ওটা নয়।

—তবে ?

—টাকা আমাদের। তাই আমাদের প্রাপ্য ওটা।

—আমি তা বুঝব কি করে ? তাছাড়া আপনারা এসব কাজ করবেন অন্যায়ভাবে তাতে আমি সাহায্য করব না।

—তাতে বিপদ হবে আপনার।

—বিপদ ? সে ভয় আমি করি না। আমি সব সময় তৈরি থাকি।

—তাহলে আমাদের কথা শুনবেন না ?

—না।

—এই আপনার শেষ কথা ?

—নিশ্চয়।

—ঠিক আছে।

টেলিফোন লাইন কেটে গেল।

হরেনবাবু বসে বসে চিন্তা করতে লাগলেন, এই সব আজব ঘটনার কথা। কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছতে পারলেন না।

॥ দুই ॥

সেদিনই সন্ধ্যা।

হরেনবাবু প্রত্যেকদিন অভ্যাসমত কাজের পর যেতেন চৌরঙ্গী অঞ্চলে। সেখানে একটা হোটেলে খাবার খেতেন, সামান্য মদ্য পান করতেন।

হরেনবাবু অবিবাহিত।

তবে একটি মেয়েকে তিনি ভালবাসতেন, মেয়েটির নাম রীণা।

মাঝে মাঝে রীণা তাঁর সঙ্গে এই হোটেলে এসে দেখা করত।

তবে রোজ সে আসত না।

সেদিন সন্ধ্যাতেও হরেনবাবু গেলেন ঐ হোটেলে।

একটু পরে রীণা এলো।

হরেনবাবু তাকে এই সব ঘটনার কথা খুলে বললেন। তারপর আরও বললেন—এখন কি করা উচিত, তা তো বুঝতে পারছি না।

রীণা বললে—তুমি যা স্থির করেছ, তা মন্দ নয়, তবে তোমার কোন একজন ভাল ডিটেকটিভের সাহায্য অবশ্যই নেওয়া উচিত।

—আমিও তাই ভাবছি।

এমনি নানা কথার পর রীণা বিদায় নিয়ে চলে গেল। হরেনবাবু আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

একঘণ্টা পরে।

হরেনবাবু সামান্য এক পেগ মত ব্রাণ্ডি খেয়ে বের হলেন হোটেল থেকে।

রাত তখন দশটা।

হোটেলের সামনে এসে ট্যাক্সি খুঁজছিলেন। এমন সময় একজনলোক এসে ডাকল তাঁকে—শুনছেন স্যার ?

—কি ব্যাপার ?

—দেশলাই আছে ?

—আছে। এই নিন।

হরেনবাবু পকেট থেকে ম্যাচ বের করে দিতে না দিতেই হঠাৎ লোকটা কি একটা আতর মাখানো রুমাল চেপে ধরল।

একটা মিষ্টি গন্ধ—

হরেনবাবু জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু লোকটা তাঁকে ধরল।

সে পাঁজাকোলা করে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল সামনে দাঁড়ান মোটরটাতে তুলে দেবার জন্যে। সেটা একটা প্রাইভেট কার।

কিন্তু হরেনবাবুকে সে গাড়িতে তুলতে পারল না।

কারণ সেই হোটেলের একজন বয়ের নজর পড়ে গেল এইদিকে।

বয় চীৎকার করে উঠল—ডাকু ! ডাকু !

তৎক্ষণাৎ হোটেলের ভেতর থেকে তিন চারজন লোক ছুটে এল পথের দিকে।

লোকটা বেগতিক দেখে পালিয়ে গেল তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে।

হরেনবাবুর জ্ঞানহীন দেহটা পড়ে রইল পথে।

হোটেলের মালিক তক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে দিলেন।

অ্যাম্বুলেন্স এলো।

তারা বললে—কি ব্যাপার ?

হোটেলের মালিক তাদের ঘটনাটা বললেন—তারা হরেনবাবুর জ্ঞানহীন দেহটা নিয়ে গেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

সেখানে যখন হরেনবাবুর জ্ঞান ফিরল তখন প্রায় দুটো বাজে।

* * *

সকাল আটটা।

হরেনবাবু তখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি ফোন করলেন রীণাকে।

রীণা ফোন ধরল।

—হ্যালো···কে ?

—আমি হরেন কথা বলছি।

—কি ব্যাপার ?

—কাল তুমি চলে যাবার পর ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেল। হোটেল থেকে বের হবার পরই। আমি এখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

—কি ব্যাপার ?

—তুমি এখানে চলে এসো। সব কথা বলব।

—ঠিক আছে।

হরেনবাবু রিসিভার রেখে দিলেন।

একটু পরেই হরেনবাবু দেখলেন রীণা ঢুকছে।

হরেনবাবু তাকে বসিয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন।

—একটা কথা—

—বল।

—ওরা ক্ষেপে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি টাকাগুলো রেখেছ কোথায় ?

—আমার অফিসে ছিল। পরে সেটা একটা ফাইলে ভরে ড্রয়ারে রেখেছি তালাবন্ধ করে। সহসা তা খুঁজে পাবে না কেউ।

—ঠিক করেছ। এখন তুমি কেমন আছ ?

—অনেকটা সুস্থ।

—ঠিক আছে। আমি আজই তোমাকে নিয়ে যাব দীপকবাবুর কাছে।

—বেশ ত!

—তিনি আমার পরিচিত। যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে আশা করি।

হরেনবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

একটু পরে ডাক্তার এলেন। তিনি হরেনবাবুকে পরীক্ষা করে বললেন—আপনার কোন ভয় নেই আর। আপনি আজই বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।

—ঠিক আছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই হরেনবাবু ছাড় পেয়ে গেলেন।

রীণাকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি তিনি ফিরে চললেন বাড়ির দিকে।

রীণা ফিরে চলল।

বললে—আমি তাহলে চলি। আজ দীপকবাবুকে ফোন করে সময় ঠিক করে রাখব। বিকেলে দেখা করব তার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে।

—আচ্ছা।

রীণা চলে গেল।

হরেনবাবু ভাবতে লাগলেন এদের দলের কথা। এই অপরাধী সংঘ ত কম ক্ষমতাসম্পন্ন নয়!

* * *

আধঘণ্টা পর।

ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

হরেনবাবু ফোন তুললেন।

—হ্যালো···কে?

—আমি অপরাধী সংঘ থেকে কথা বলছি। আপনি কি মনস্থির করেছেন?

—কি বিষয়ে?

—আমাদের জিনিস কি ফেরৎ দেবেন?

—না। ও টাকা আপনাদের নয়!

—কাল আপনাকে হাতে পেয়েছিলাম—অল্পের জন্যে ব্যর্থ হয়েছি। যা হোক, এভাবে নিজের বিপদ আর বাড়াবেন না।

—কিন্তু কখনো আমি কোনও অন্যায় কাজ করিনি, করবও না।

বেশ, দেখা যাবে। নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছেন। আপনি জানেন না আমরা কত বেশী শক্তিশালী।

কানেকশন কেটে যায়।

হরেনবাবু চিন্তা করতে থাকেন। দীপক চ্যাটার্জী কি এদের বিরুদ্ধে সফল হতে পারবেন?

তারপরেই মনে পড়ে তাঁর দীপকের শক্তি ও আন্তর্জাতির খ্যাতির কথা।

হরেনবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হন।

॥ তিন ॥

বিকেল পাঁচটা।

রীণা আর হরেনবাবু বাড়ি থেকে বের হলেন দীপকের বাড়িতে যাবার উদ্দেশ্যে।

হরেনবাবু লক্ষ্য করে দেখলেন, তার বাড়ির উলটো ফুটপাতে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পানের দোকানের পাশে।

গায়ে তার আদ্দির পাঞ্জাবি, তার উপরে সাদা সুতো দিয়ে কাজ করা। পরনে পাজামা।

লোকটা ওদের বের হতে দেখেই একপাশে সরে গেল।

হরেনবাবু আর রীণা একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে বসলেন।

লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে অন্য ট্যাক্সি নিয়ে তাঁদের অনুসরণ করল।

ট্যাক্সি ছুটছিল।

হরেনবাবু তখন রীণাকে বললেন সব কথা।

রীণা বললে—ওরা তাহলে তোমার উপরে নজর রেখেছে—তাই না?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। এক কাজ কর।

—কি?

—সোজা দীপকবাবুর বাড়িতে না গিয়ে খুব জোরে ট্যাক্সি চালিয়ে নানা পথ ঘুরে তারপর সেখানে যাওয়া যাক।

—তাতে লাভ নেই—ওরা ফলো করবেই। তার চেয়ে বরং আর এক কাজ করি।

—কি?

—সোজা দীপকবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকেই সব কথা খুলে বলি।

—তা মন্দ নয়। তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ওঁরা সোজা দীপকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

* * *

দীপক রীণাকে চিনত।

সে ওদের দেখে বললে—কি ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এখানে?

রীণা বললে—আমার বন্ধুর সম্পর্কে অনেক ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে।

দীপক ওদের কথায় মন দিল।

হরেনবাবু সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বললেন। এমন কি তাঁকে যে ওরা এখনো ফলো করছে তাও বলতে ভুললেন না।

সব শুনে দীপক বললে—ঠিক আছে, আমি দেখছি কি ব্যাপার।

হঠাৎ দীপক ঢুকল পাশের ঘরে।

সামান্য মেকআপ করে নিল। তাকে দেখে তখন ঠিক একজন কাবুলিওয়ালা বলে মনে হবে।

সে বাড়ির পিছন দিকের দরজা দিয়ে বের হলো।

তারপর দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল, সেই লোকটা এখনো একটা তেলেভাজার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর তাকাচ্ছে দীপকের বাড়ির দিকে।

দীপক চুপচাপ তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে তার দিকে ধরে বললে—এক পা নড়বার চেষ্টা করো না চাঁদ—তাহলে প্রাণটি যাবে।

লোকটা চমকে উঠল।

দীপক বললে—আরে, এ যে আমাদের চেনা লোক দেখছি। তা কেলেসোনা, কি হঠাৎ কি দল পালটে ফেললে নাকি?

লোকটা দীপককে এবার চিনতে পারল।

দীপক বললে—সুড় সুড় করে আমার সঙ্গে চলে এসো।

কেলেসোনা চলল।

একটু পরেই দীপকের বাড়িতে এলো সে।

দীপক এবারে হরেনবাবুকে বললে—এই যে, এই মহাত্মা আপনাদের ফলো করছিল। তা কেলেসোনা, এখন দস্যু নিয়তির দল ত্যাগ করেছ নাকি?

—হ্যাঁ হুজুর।

—এখন কোন দলে কাজ করছ?

—কোন দলে কাজ করছি না।

—মিথ্যা কথা। তাহলে তুমি ঐ ভদ্রলোককে ফলো করছিলে কেন?

—না না, এমনি একটু বেড়াতে—

দীপক তার গালে প্রচণ্ড চড় মেরে বললে—চুপ, মিথ্যা কথা বলবে না! যা সত্যি তা স্বীকার কর।

এবার কেলেসোনা বললে—হ্যাঁ, স্যার। সত্যি আমি ফলো করছিলাম।

—কেন?

—কর্তার নির্দেশ।

—কে তোমাদের কর্তা?

—অপরাধী সংঘের দলপতি। একজন সাহেব তাদের এখানকার দলের এজেন্ট।

—তার নাম কি?

—নাম জানি না।

—ঠিক আছে, তোমাকে আজ ছেড়ে দিলাম। আমি চুনো-পুঁটি নিয়ে মাথা ঘামাই না। তোমার সাহেবকে গিয়ে বলবে, এভাবে ভারতের বুকে কাজ বেশিদিন চলবে না। কি করে সব স্মাগ্‌লার দলকে শাস্তি দিতে হয়

তা আমি জানি। যে টাকার লোভে তোমরা ঘুরছ, তা সরকারী ট্রেজারিতে জমা হয়ে গেছে। এখন অন্য দিকে মাথা ঘামাওগে যাও।

দীপক কেলেসোনাকে ছেড়ে দিলে।

দৌড়ে চলে গেল সে।

একটু পরে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল ঘন ঘন।

দীপক ফোন ধরল।

—হ্যালো, কে?

—আমি অপরাধী সংঘের ভারতীয় ব্রাঞ্চের এজেন্ট।

—বেশ, তা কি চান?

—তুমি যত বড় গোয়েন্দাই হও না কেন, আমাদের পেছনে লাগতে এসো না।

—সে আমি বুঝব।

—ঠিক আছে, তোমার বন্ধুকে বলো সে যেন টাকাটা আমাদের হাতে দেয়।

—তার আশা ছাড়। সেটা সরকারী ট্রেজারিতে জমা হয়ে গেছে।

—মিথ্যা কথা। আচ্ছা দেখা যাক, তুমি কি করে এদের রক্ষা করতে পার।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

দীপক বললে—এমন শাস্তি ওদের দেব যে ওরা বুঝবে আমি কে!

তাকে বেশ চিন্তিত মনে হলো।

॥ চার ॥

দীপক হরেনবাবুর দিকে চেয়ে বললে—কটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—বলুন।

—আপনি টাকাগুলো কি অবিলম্বে জমা দিতে চান সরকারী ট্রেজারিতে?

—হ্যাঁ।

—ভাল কথা। আর যে কোম্পানীর পার্সেল এসেছে তাদের চিঠি দিয়েছেন?

—নিশ্চয়ই।

—আমার মনে হয়, তারাও এ ব্যাপারটা বোধ হয় জানে না।

—আমারও তাই মনে হয়।

—এই যে দলটি এই কাজ করছে তারা হলো একটা ইণ্টার-ন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল দল। যা হোক—আপনি টাকাটা জমা দিয়ে দিলেই আর ভয় নেই।

—ঠিক আছে।

—আমি কাল আপনার অফিসে গিয়ে দেখা করব। আমি আপনার সঙ্গে থেকে ওটা জমা করিয়ে দেব—তাহলে আর কোন ভয় নেই।

—আচ্ছা।

হরেনবাবু আর রীণা বেরিয়ে গেলেন।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল রতনলাল।

দীপক বলল—আমরা নতুন একটা কাজে নামতে চাই রতন।

—কবে?

—অবিলম্বে। যদিও বর্তমানে এটা সামান্য—তবে যে দলের বিরুদ্ধে আমরা নামছি—তারা সহজে রেহাই দেবে না আমাদের।

—কি রকম?

রতনকে সব কথা খুলে বলল দীপক। দীপকের সব কথা শুনে সে বললে—তা এটা বেশ জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে।

—খুব জটিল নয়। তাহলেও এটা বুঝতে হবে। তা না হলে জটিল মনে হবে। বলে দীপক হাসল।

রতন বললে—ঠিক আছে এখন থাক—পরে শুনব।

রতন উঠে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

* * *

গভীর রাত।

ঘুমিয়ে পড়েছে সারা পৃথিবী যেন নিথর একটা নিদ্রার কোলে।

দীপকও নিজের ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন।

রাত তখন কত বলা যায় না। বোধ হয় দুটো কি তিনটে হবে।

আকাশে চাঁদ নেই। তবে কয়েক দিন পরেই পূর্ণিমা তিথি আসন্ন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল দীপকের।

কি করে কেন এত রাতে ঘুম ভাঙল তা সে বুঝতে পারল না।

তার ওপর এত রাতে তার ঘরের আশেপাশে কোথায় যেন কি একটা স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল দীপক।

খস্ খস্—

সে উঠে বসল বিছানার ওপরে ধড়মড় করে। দীপক কান পাতল।

চারিদিকে তাকাল।

আবার শব্দ।

দীপক তাকাল জানালার দিকে। দেখতে পেলো একটা কালো হাতে নিচ থেকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে তার জানালাটা ধরল।

লোমশ কালো হাত।

তার পরই দেখা গেল একটা মুখ—বীভৎস কালো মুখ—

হাতে তার ঝক্‌ঝক্ করছে বিরাট একটা ছোরা।

দীপক চট করে উঠে দাঁড়াল। বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা বের করে সে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল জানালার দিকে।

কিন্তু জানালা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারল না সে। তার আগেই লোকটা বিপদ বুঝে পালাল।

দীপক গুলি ছুঁড়ল।

গুড়ুম্···

নৈশ রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে খান্-খান্ হয়ে গেল।

কিন্তু গুলি লোকটির গায়ে লাগল না—সে সরে গিয়েছিল, তাই তার পাশ দিয়ে চলে গেল।

ঝুপ!

একটা শব্দ শোনা গেল।

লোকটা লাফ দিয়ে পড়ল দোতলা থেকে সোজা একতলায়।

তারপর দ্রুত দৌড়ে পথ পার হয়ে অন্য দিকে পালাল।

তার মূর্তিটা যেন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল পথের বাঁকে।

এদিকে গুলির শব্দে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো রতনলাল।

—কি ব্যাপার রে?

—একটা শত্রুর চর! রাতের বেলা এসেছিল আমাকে শেষ করতে।

রতন আলো জ্বালল।

ঘরটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

দীপক দেখল, ঘরের কোণে একটা কাগজ পড়ে আছে। একটা চিঠি। তাতে লেখা :

প্রিয় গোয়েন্দামশাই,

এখনো বলছি আমোদের দলের বিরুদ্ধে কাজে নামবেন না। সাবধান। এর ফল ভয়াবহ হবে। ইতি—

দলপতি, অপরাধী সংঘ।

দীপক হাসল। বললে—ওরা দীপক চ্যাটার্জীকে চেনেনি—তাই এই চিঠি।

—হ্যাঁ। তবে শীগগির চিনতে পারবে বলে আশা করি।

কথাটা বলে রতন হেসে উঠল।

—যাক্ গে এখন ঘুমোতে চল—কাল সকালে অনেক কাজ।

* * *

পরদিন সকাল।

খুব ভোরে উঠে দীপক তৈরী হয়ে নিল ছদ্মবেশ পরে।

বেলা ঠিক দশটায় সে এলো হরেনবাবুর অফিসে। সেখানে ছিলেন হরেনবাবু আর রীণা।

দীপককে দেখেই হরেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

—আসুন—এদিকে দেখুন কি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেছে এখানে।

—কি ব্যাপার ?

—সারা অফিস তন্ন তন্ন করেছে কারা যেন। সব জিনিস যেন তছ্‌নছ্‌ করে গেছে তারা।

—তালা ছিল না ?

—ছিল। তালা ভেঙে ঢুকেছিল বোধ হয় তারা কাল রাতে।

—বুঝেছি, এটা ওদেরই কাজ।

—কিন্তু কি উপায় ?

—উপায়ের কথা পরে ভাববেন। আপনি এলেন এখানে কতক্ষণ ?

—মিনিট পাঁচ ছয় হবে।

—আপনার সে ফাইলটা কোথায়, যে ফাইলে টাকা ছিল ?

—দেখছি।

হরেনবাবু তন্ন তন্ন করে সারাটা ঘর বেশ ভাল করে খুঁজলেন।

বললেন—তাই ত, ফাইলটা কোথায় ? এত সব ফাইলের স্তূপের মধ্যে—হঠাৎ নজর পড়ল একদিকে।

আট দশটা ফাইলের স্তূপের মধ্যে নির্দিষ্ট ফাইলটা পাওয়া গেল।

সেটা খুলল দীপক।

দেখে তার মধ্যে নোটের তাড়াগুলো সব ঠিকই সাজান আছে।

দীপক বললে—ভাগ্যিস এগুলো এভাবে রেখেছিলেন—তা না হলে এগুলো পাওয়া যেত না।

—তা বটে।

তক্ষুনি সেগুলো নিয়ে তারা গেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। দীপক সব টাকা জমা দিলে সেখানে হরেনবাবুর নামে।

টাকা জমা দেবার পর দীপক বললে—যাক, একটা ফাঁড়া কাটল এখন পরবর্তী তদন্তের জন্যে আমাকে তৈরী হতে হবে।

তারপর দিন পনেরো কাটল—তবু আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

পরবর্তী কোন পথ ধরে যে ওরা এগিয়ে চলেছিল তা দীপক বুঝতে পারল না।

। পাঁচ ।

কয়েকদিন পরে।

সেদিন ভোরবেলা।

কলিং বেলের শব্দে দীপকের ঘুম ভেঙে গেল।

দীপক উঠে বসল।

এত সকালে আবার কে এলো বিরক্ত করতে?

দীপক উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে টেলিগ্রাম পিয়ন। সে বললে—বাবুজী, আপনার তার।

—কোত্থেকে এসেছে?

—জামসেদপুর থেকে।

দীপক সই করল। তারপর টেলিগ্রাম পড়ে বিস্মিত হলো।

টেলিগ্রাম করেছে দীপকের বান্ধবী তন্দ্রা। বহুদিন থেকে সে দীপকের নিকটতম বান্ধবী। এমন কি একসময় দীপককে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু দীপক রাজী না হওয়াতে তা হয়নি।

সম্প্রতি একটা মহিলা সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে সে গিয়েছিল জামসেদপুরে।

সেখান থেকেই টেলিগ্রাম করেছে সে।

তাতে লেখা ছিল:

'তার পাওয়া মাত্র জামসেদপুরের কাছে মোহনপুর অঞ্চলে চলে এসো। এখানে এলে সব কিছু বলব। তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম। বিশেষ জরুরী জানবে। —তন্দ্রা।'

তারটা পড়েই দীপক যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নিল। সুটকেস বেডিং গুছিয়ে নিল। পথে নেমে সে ট্যাক্সি খুঁজছিল।

এমন সময় দেখা গেল রতনকে।

রতন বেরিয়েছিল একটা কাজে। ফিরে দেখে দীপক বাইরে যাচ্ছে।

—কোথায় চললি?

—জামসেদপুর।

—এই সকালে হঠাৎ—

—হ্যাঁ, জরুরী কাজ।

—তার মানে?

—মানে, এই দেখ।

তারটা দীপক বের করে তুলে দিল রতনের হাতে। রতন তা পড়ে বললে—আমিও যাব।

—কেন?

—এতে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি। তাছাড়া এদিকেও ত বিশেষ কাজ নেই।

—বেশ, তবে চল।

রতন এক ছুটে ভেতরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সুটকেস বেডিং নিয়ে চলে এলো নিচে। বাড়িতে রইল কেবল চাকর ভজুয়া।

তারপর ট্যাক্সি ডেকে তারা চলল হাওড়া ষ্টেশনের দিকে দ্রুতগতিতে।

* * *

জামসেদপুর অঞ্চলের একটি আধা মফঃস্বল শহর হলো মোহনপুর।

এটি ছোট শহর হলেও প্রাচীন ইতিহাসবিখ্যাত শহর।

এই শহরের প্রবেশদ্বারে একটা খুব বড় মহাদেবের মন্দির ছিল। এটি খুবই প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের মূর্তিটিও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

তন্দ্রা তার দু' তিনজন মহিলা সঙ্গী নিয়ে গিয়েছিল সেই মন্দির দর্শন করতে খুব ভোরে।

কিন্তু গিয়েই যা দেখল, তাতে তারা স্তম্ভিত হলো। তারা শুনতে পেল যে মহাদেবের প্রাচীন মূর্তিটি চুরি গেছে মন্দির থেকে—আর মন্দিরের সামনেই পাওয়া গেছে পূজারীর মৃতদেহ।

কে বা কারা তাকে ছুরি মেরে হত্যা করেছে।

শহরের বহু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। খবরটা শুনে মহিলা সমিতির অন্য মহিলারা ভীত হলেও তন্দ্রা আর সম্পাদিকা জয়শ্রী দেবী ভয় পায়নি।

তারা শহরের লোকদের বললে—আপনারা দুশ্চিন্তা না করে এক্ষুনি পুলিসে খবর দিন। পুলিস সব ব্যবস্থা করবে।

—কিন্তু কারা এ কাজ করল? শহরে কি কোন দস্যুদল ঢুকেছে?

—তা হতে পারে। আচ্ছা মূর্তির গায়ে কি দামী গহনা ছিল?

—মূর্তির গলায় যে মালা ছিল তার দামই ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার কি লাখ টাকা আর মূর্তিটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

তন্দ্রা সব শুনল।

তক্ষুনি মহিলা সমিতির কয়েকজন লোক নিয়ে তারা গেল থানায়। পুলিস অফিসার মিঃ রামকুমার বললেন যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

তন্দ্রা তাঁকে বললে যে তার বন্ধু দীপক একজন নামকরা গোয়েন্দা। তাকে এ কেসের সাহায্যের জন্যে সে আনতে পারে কি না?

রামকুমার অসম্মতি প্রকাশ করলেন না।

তাঁর সম্মিত পেয়েই তন্দ্রা টেলিগ্রাম করেছিল দীপককে।

বেলা বারোটায় দীপক আর রতন এসে উঠল তন্দ্রার কোয়ার্টারে।

তন্দ্রা খুশী হলো।

অবিলম্বে কাজ যাতে শুরু হয় সে তাই চাইছিল তখন।

রতন বললে – এত জরুরী তলব কেন ?

তন্দ্রা সব খুলে বললে।

দীপক বললে—লাশ কি পোস্টমর্টেমে চলে গেছে নাকি ?

—না। আমি বারণ করে রেখেছি !

—চল দেখে আসি।

সামান্য কিছু খেয়ে নিয়েই দীপক আর রতন চলল থানার দিকে।

থানায় গিয়ে রামকুমারের সঙ্গে পরিচয় করে তারা চলল লাশ দেখতে।

ছুরির আঘাতেই যে পূজারীর মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে ওরা একমত হলো। মৃতদেহের তিন জায়গায় গভীর ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

রামকুমার বললেন—আচ্ছা, একটা কথা দীপক বাবু—

—বলুন।

—একটা দুর্বল পূজারীকে হত্যা করতে তিনবার ছুরি মারতে হলো কেন?

—কারণ আছে। পাছে হত্যাকারীকে চিনতে পারে পূজারী, তাই পিছন দিক থেকে আচমকা এসে পূজারীর মুখ-চোখ চেপে ধরে ছুরি মেরেছে লোকটা। যদি পূজারী না মরে তাহলে বিপদ—তাই নিশ্চিন্ত হবার জন্যে তিনবার ছুরি মারা হয়। তা ছাড়া সামনের দিক থেকে মারের যতো সুবিধা, পেছন দিক থেকে তত নয়।

—তা বটে।

—তাহলে এটা মনে করা যায় যে লোকটা পূজারীর পরিচিত ছিল

—তা ঠিক। একটা কথা দীপকবাবু—

—বলুন।

—আপনি এ কেসে সাহায্য করবেন ত ?

—নিশ্চয়।

ধন্যবাদ! তাহলে আমি অনেকটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কারণ, আমার শত কাজের মাঝে এ তদন্তের বিশেষ সময় হবে।

—তা বটে। আচ্ছা, এই মন্দিরের বর্তমান ট্রাষ্টি কে বলুন ত?

—মোহনলাল শেঠ নামে একজন লোক তার ছেলে লছমনলাল। শেঠ মোহনলাল খুব ধার্মিক লোক। তিনি নিয়মিত মন্দিরে এসে পূজা দেন।

—বুঝেছি।

দীপক বললে—আচ্ছা, আজকের মত চলি। পরে আবার দেখা করব।

দীপক বিদায় নিল।

তারপরে ফিরে এলো তন্দ্রার কোয়ার্টারে। তখন বেলা প্রায় দুটো বাজে।

খেয়ে-দেয়ে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়ল দীপক।

॥ ছয় ॥

পরদিন সকাল সাতটা।

একজন লম্বা দাড়িওলা সাধুকে একটা গাছের তলায় তার চেলার সঙ্গে দেখা গেল বসে থাকতে।

সাধু বসেছিল চোখ বুজে।

তার চেলা মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছিল—ব্যোম শঙ্কর।

ক্রমে সেখানে লোকজন জমে উঠতে লাগল।

একজন বৃদ্ধ সাধুর সামনে এসে বলল—আমার একটা মাত্র মেয়ে বাবা। তার বিয়ে হচ্ছে না।

সাধুবাবা গম্ভীর কণ্ঠে বললে—জানি।

—কবে হবে?

—চার আনা পয়সা রাখ্। হাত দেখা।

লোকটি চার আনা পয়সা রেখে হাত দেখাল। সাধু বললে—তিন মাসের মধ্যে তোর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে।

—আচ্ছা বাবা।

লোকটি প্রণাম করে উঠে গেল।

তারপর ক্রমে ক্রমে লোক জমতে শুরু হয়ে গেল সেখানে।

সকলেই আসে আর চার আনা করে পয়সা ফেলে দিয়ে হাত বাড়ায়।

হাত দেখে সন্ন্যাসী তাদের ভবিষ্যৎ বলে দেয়।

এমনিভাবে বহুক্ষণ কাটল।

অবশেষে বেলা বারোটা নাগাদ এলো একজন কালো মত লোক।

সেও নমস্কার করে চার আনা পয়সা রাখল।

তারদিকে চেয়ে সন্ন্যাসী বললে—তোর ত এখন সময় খারাপ।

—কেন বাবা?

—তোর পেছনে লোক লেগেছে।

—কে বাবা?

—তুই যেখানে কাজ করিস তারাই সব হলো তোর বিপক্ষে।

—সেকি বাবা।

—সত্যি বলছি।

—এর প্রতিকার কি বলুন ত বাবা?

—প্রতিকার?

—হ্যাঁ।

—তা হলে এখন ত হবে না।

—তবে?

—তোকে আসতে হবে ঠিক সন্ধ্যাবেলায়।

—এখানে?

—হ্যাঁ।

—বেশ আসব।

লোকটা চলে গেল। ধীরে ধীরে ভিড় কমে আসতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী উঠে পড়ল।

ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত যে, ঐ সন্ন্যাসী স্বয়ং দীপক চ্যাটার্জি ছাড়া আর কেউ নয়। আর তার চেলাটি হলো রতনলাল।

দীপক বললে এবার খাবার ব্যবস্থা ত করতে হবে। তুই রান্না কর।

—তা ত হলো—কিন্তু এত সব করে কি লাভ হলো বল ত?

—লাভ হয়েছে।

—কি রকম ?

—সব শেষে যে লোকটি হাত দেখাল সে আজ রাত্রে নিশ্চয় আসবে।

—কে সে ?

—ওদের দলের লোক। কিছু খবর আমি নিশ্চয় বের করতে পারব সেখানে থেকে।

—ঠিক আছে।

* * *

সন্ধ্যা নামল।

সেই লোকটিকে দেখা গেল ধীর পায়ে সন্ন্যাসীর আশ্রমের দিকে এগিয়ে আসতে।

কিন্তু সে আসতে পারল না। পথেই বাধা পেল।

একটা ছোরা কোত্থেকে ছুটে এসে বিঁধে গেল তার পিঠের মাঝে।

লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর ছুটে এলে সে।

ছুটতে ছুটতে সন্ন্যাসীর আশ্রমের কাছে এসে সে পড়ে গেল।

দীপক ছিল সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে। সে পিছন ফিরে গুলি করল একটা ঝোপ লক্ষ্য করে।

যে অন্ধকারে ছুরি মেরেছিল, সে বিপদ বুঝে পালিয়ে গেল।

দীপকরা বেরিয়ে এলো।

দীপক ও রতন ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছিল।

দীপক লোকটিকে বললে—কি হলো ভাই ?

—জানি না। ঝোপের মধ্যে থেকে কে ছুরি ছুঁড়ে মেরেছে।

—নিশ্চয় তারা শয়তানের দল। তোমার ভয় নেই, এসো আমার সঙ্গে।

দীপক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলল সোজা একটা ডাক্তারখানায়।

ডাক্তার ভালো করে পরীক্ষা করলেন তাকে। বললেন—বেশি গভীর ক্ষত নয়—কোনও ভয় নেই।

তিনি ড্রেস করে তাকে ছেড়ে দিলেন।

দীপক ও রতন তারপর লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল থানায়।

থানা অফিসার রামকুমার বললেন—কি ব্যাপার দীপকবাবু?

—এই লোকটা ওদের দলের।

—কোথায় ধরলেন?

—সেকথা থাক। আগে একে কিছু প্রশ্ন করতে হবে।

দীপক বললে—তোমার নাম কি?

—কাল্লু।

—এখানেই থাক?

—হ্যাঁ।

—কি কর তুমি?

—মজদুরী করে খাই?

—ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ, সত্যি কথা।

—মিথ্যা কথা। যাক্, সে-সব কথা পরে হবে। মিঃ রামকুমার, আপনি একে আজ রাত্রে থানায় আটকে রাখুন।

—কেন?

—তা না হলে ওর বিপদ।

—ঠিক আছে।

রামকুমার লোকটিকে থানায় বন্ধ করে রেখে দিলেন।

সাত।

রাত্রিবেলা দীপক ও রতন বাড়ি ফিরল।

তন্দ্রা বসেছিল।

সে খাবার তৈরি করল। ওরা খেয়ে নিল।

মহিলা সমিতির সম্পাদিকা জয়শ্রী দেবী তারপর দেখা করল দীপকের সঙ্গে।

—নমস্কার। বসুন।

—হ্যাঁ—তারপর খবর কি?

—খবর ভাল। কাজ দ্রুতবেগে চলেছে। খুব শিগ্‌গীর সফল হবো।

—ঠিক ত?

—নিশ্চয়।

—সফল হতেই হবে—তা না হলে আমাদের ত বদনাম।

—এখানকার অনেকে বলছে যে মহিলা সমিতির মহিলাদের মধ্যেও অনেকে এই দলে আছে।

—সেকি কথা!

—সত্যি বলছি।

—আপনি নিশ্চিত থাকুন—শিগ্‌গীর আমি সন্ধান করছি ও-দলের লীডারকে।

—ধন্যবাদ!

জয়শ্রী দেবী বেরিয়ে গেলেন।

দীপক ও রতন ক্লান্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ল তক্ষুনি।

পরদিন।

বেলা আটটা।

দীপক গেল থানায়। দেখা করল মিঃ রামকুমারের সঙ্গে।

—আসুন।

—নমস্কার। খবর কি?

—খবর ত কিছু নেই। আজো ত হত্যার কোন কিনারা হলো না।

—শিগগীর হবে। কালকের সেই লোকটা কোথায়?

—হাজতে।

—কেমন আছে সে?

—ভালই।

—ঠিক আছে—তাকে একবার ডাকুন।

তাকে ডাকা হলো। লোকটা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে।

দীপক বললে—তোমাকে আমরা ছেড়ে দিলাম—কারণ, তোমার কোন দোষ নেই।

—ধন্যবাদ স্যার!

সে চলে গেল।

দীপককে রামকুমার বললেন—ওকে ছেড়ে দিলেন?

—হ্যাঁ। দলপতিকে না ধরে ওসব চুনো পুটি ধরে লাভ কি?

—তা বটে।

* * *

এদিকে দীপকের নির্দেশে রতন ফলো করে চলল লোকটিকে।

রাস্তায় নেমে কাল্লুকে অনুসরণ করে চলল রতন দূর থেকে।

কাল্লু চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললো।

না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না—সে নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু রতন দূর থেকে তাকে ঠিকই অনুসরণ করে চলল।

ক্রমে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে এলো শহরের বাইরে।

বাঁকা পথ।

কাল্লু এগোল ধীর পায়ে। আরও এগিয়ে একটি পার্বত্য উপত্যকা। সেদিকে এগিয়ে চললো সে।

রতন একই ভাবে অনুসরণ করে চলল তাকে।

অবশেষে তারা এসে পৌঁছল একটা পার্বত্য উপত্যকায়।

তারপর লোকটা একটা গুহাপথে যেন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

রতন এগোল।

না, লোকটা নেই।

রতন আরো এগিয়ে চললো। এগিয়ে গেল সেই গুহার কাছে।

কিন্তু পথ বন্ধ।

এমন সময় একটা জোর আঘাত এসে পড়ল তার মাথায়।

পড়ে গেল রতন। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল সে, পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে সে গড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু জ্ঞান হারালেও আঘাত খুব বেশী হলো না তার।

* * *

কিছুক্ষণ পরে।

রতনকে খুঁজতে খুঁজতে দীপক এলো সেই পথ ধরে।

এসে দেখে, রতন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে পথের পাশে।

দীপক তাকে তুলল।

তারপর তাকে নিয়ে এলো একজন ভালো চিকিৎসকের কাছে।

তিনি রতনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। তারপর অচৈতন্য রতনকে নিয়ে দীপক বাসায় ফিরল।

বাসায় ফেরার একটু পরে রতনের জ্ঞান ফিরে এলো।

দীপক বললে—কি হয়েছিল বল।

রতন সব বললে।

দীপক সব শুনে বললে—ঠিক আছে, তাহলে ঐ পার্বত্য গুহাতে ওদের একটা আড্ডা আছে।

—তা বটে।

দীপক পরবর্তী প্রোগ্রাম স্থির করতে লাগল মনে মনে।

* * *

আরো রাতে।

দীপক গেল থানায়। দেখা করল রামকুমারের সঙ্গে।

রামকুমার বললেন—কি খবর ?

—খবর ভাল।

—সন্ধান কিছু পেলেন ?

—পেয়েছি। কিন্তু এক্ষুণি একদল পুলিস নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায় ?

—আমি যেখানে নিয়ে যাব।

—বেশ তো।

তক্ষুনি তিনি আদেশ দিলেন একদল পুলিসকে তৈরী হতে।

তারা তৈরী হলো।

দীপক তাদের নিয়ে চলল সেই পাহাড়ের দিকে।

* * *

নির্দিষ্ট অঞ্চল।

দীপক খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের গায়ে পেল একটা গুহার সন্ধান।

একটা বিরাট পাথরে ঢাকা সেই গুহা-মুখ। দীপক ঠেললো, কিন্তু খুললো না কিছুতেই।

দীপক খুঁজতে খুঁজতে পেল একটা সুইচ। সে সুইচটা টিপল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অংশ সরে গেল। দেখা গেল, একটা সুড়ঙ্গপথ।

দীপক সদলে সেই পথ ধরে ভেতরে ঢুকল।

এঁকে বেঁকে সেটা শেষ হয়েছে একটা ফাঁকা জায়গায়।

সেখানে এসে পথটা শেষ হয়েছে, দেখা গেল, একটা পোড়ো বাড়ি রয়েছে সেখানে।

মিঃ রামকুমার বললেন—এ পোড়ো-বাড়ি ত আমি চিনি।

—চেনেন ?

—হ্যাঁ। এখানে আগেও এসেছি। কিন্তু এ বাড়িতে কি আছে ?

—চলুন না।

তারা ভেতরে যাবার জন্যে তৈরী হলো।

॥ আট ॥

গভীর রাত।

নিশ্ছিদ্র আঁধার চারিদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

অন্ধকার এত গঢ় যে কাছের জিনিসকেও ভাল করে দেখা যায় না।

তার মধ্যে টর্চ ফেলে ওরা এগিয়ে চললো।

রামকুমার ডাক দিলেন—দীপকবাবু!

—কি?

—কাউকে ত দেখছি না।

—তাই ত!

—তবে কি পাখি ভেগেছে?

—তাই ত মনে হচ্ছে।

—এখন কি করা যায়?

—ভয়ের কিছু নেই। আমরাও ত সংখ্যায় কম নেই। দেখা যাক না সার্চ করে।

—ঠিক কথা।

সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হলো। কিন্তু দেখা গেল না কাউকে।

দীপক চিন্তিত হলো।

রতনকে অজ্ঞান করেই ওরা ভেগেছে। তা না হলে কেউ নেই কেন?

রামকুমার বললেন—চলুন ফিরে যাই।

—না।

—কেন ?

—আমরা অন্ধকারে অপেক্ষা করব চুপচাপ। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

—বেশ।

ওরা বসে রইল একটা বারান্দার কোণে চুপ করে আঁধারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে।

সময় কেটে চলল···

রাত বাড়ল।

তবুও কেউ এলো না। পুলিস বাহিনী চিন্তিত হয়ে পড়ল। আর কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করবে তারা ?

ঢং ঢং—

রাত বারোটা বাজল।

এমন সময় ছাদের ওপরে শোনা গেল একটা অদ্ভুত শব্দ।

রামকুমার ফিস্-ফিস্ করে বললেন—কি ব্যাপার তা ত বোঝা যাচ্ছে না।

দীপক উৎকর্ণ হয়ে রইলো।

—চলুন ছাদে যাই।

ছাদে এল ওরা পা টিপে টিপে।

দেখে, ছাদের কোণে একটা মূর্তি।

এগিয়ে গেল ওরা পিস্তল উঁচিয়ে। দীপক প্রশ্ন করল—কে তুমি ?

দেখা গেল, একটা নারীমূর্তি। মিশ্ কালো তার গায়ের রঙ।

মূর্তিটি অনুনাসিক কণ্ঠে বললে—আমি এ বাড়ির পেত্নী। তোরা পালা।

পুলিসরা ভয় পেল।

কিন্তু ভয় পেল না দীপক আর রামকুমার।

দীপক বললে—সাবধান! আমরা ভূত-পেত্নী মানি না। নড়লেই গুলি করব।

মূর্তিটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

দীপক পিস্তল উদ্যত করে টর্চ জেলে এগিয়ে গেল তার কাছে।

দেখে ঘন কৃষ্ণ পোশাকে আবৃত একটি কৃষ্ণকায় নারীমূর্তি।

দীপক তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে বললে—চলুন শীগ্‌গীর।

পুলিসবাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে নিচে নিয়ে এলো তক্ষুনি।

তারপর সারারাত ধরে অপেক্ষা করে রইল তারা। কিন্তু আর কাউকেই দেখা গেল না।

ভোর হয়ে এলো।

পুলিসবাহিনী সেই পেত্নীবেশী মেয়েটিকে নিয়ে থানায় ফিরল।

* * *

থানায় দীপক একটু চেষ্টা করতেই পেত্নীবেশী সেই মেয়েটির ছদ্মবেশ খুলে ফেলল।

দেখা গেল সে গায়ে কোনো রঙ মেখেছিল। আসলে সে সুন্দরি পরমাসুন্দরীও বলা যায় মেয়েটিকে।

দীপক বললে—তোমার নাম কি?

—মায়া।

—তুমি একাজ কর কেন?

—টাকার লোভে।

—কে টাকা দেয়?

—তাদের চিনি না। এই কাজ করি বলে তারা মাঝে মাঝে টাকা দেয়।

—কেন?

—যাতে কোন লোক ভয়ে ঐ পোড়া বাড়ির মধ্যে না ঢোকে।

—তোমাকে কত টাকা দেয়?

—রোজ দশ টাকা করে।

—তুমি জান একাজ অন্যায় ?

—না। আমি গরীবের মেয়ে—অর্থের লোভে কাজ করি।

—তোমাকে যদি ভালভাবে বাঁচবার সুযোগ করে দিই ?

—কি ভাবে ?

—এখানকার মহিলা সমিতির সম্পাদিকা আমার বান্ধবী। তিনি তোমার সব খরচের ভার নেবেন। তিনিই তোমাকে মানুষ করে তুলবেন।

—কিন্তু আমি ঐ সব উঁচুদরের মেয়েদের সঙ্গে কি মিশতে পারব ?

—নিশ্চয় পারবে।

—বেশ। তবে আপত্তি নেই।

দীপক রামকুমারকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললে—আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

—পালাবে না ত ?

—না। আমি ওর ওপরে নজর রাখতে বলে দেব।

—ঠিক আছে।

* * *

দীপক ওকে নিয়ে গিয়ে জয়শ্রী দেবীর হাতে তুলে দিল। তারপর তাকে ফিস-ফিস করে কি যেন বলল।

জয়শ্রী দেবী বললেন—ঠিক আছে।

—কোথাও যেন একা না বের হয়, তা দেখবেন।

—আচ্ছা।

জয়শ্রী দেবীর কাছে মায়াকে রেখে দীপক বের হলো পরবর্তী কাজের উদ্দেশ্যে।

* * *

দীপক দেখা করল মন্দিরের ট্রাষ্টি শেঠ মোহনলালের সঙ্গে।

তিনি বললেন—আমি খুব খুশী হয়েছি মিঃ চ্যাটার্জী যে আপনি একাজে হাত দিয়েছেন।

—আমি মহিলা সমিতির অনুরোধে—

—বুঝেছি। কিন্তু আপনি কি পারবেন এই গোপন হত্যাকারীকে বের করতে?

—চেষ্টা করব।

—কি ওদের উদ্দেশ্য বলুন ত?

—আমার মনে হয় এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে একটি সর্বভারতীয় দল আছে।

—তাদের উদ্দেশ্য?

—উদ্দেশ্য নিশ্চয় ধরা পড়বে।

—বেশ, আপনি ওদের ধরতে পারলে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। পূজারীকে আমিও শ্রদ্ধা করতাম।

এমন সময় ঘরে ঢুকল মোহনলালের ছেলে লছমনলাল।

মোহনলাল পরিচয় করালেন—আমার ছেলে লছমন। ইতিহাসের ছাত্র।

—নমস্কার!

—আর ইনি হচ্ছেন ভারতবিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী। পূজারী হত্যার কেসের তদন্ত করছেন।

—শুনে খুশী হলাম।

দু' একটা কথা বলে লছমন বিদায় নিল। দীপকও উঠে দাঁড়াল।

* * *

দীপক চলল বাড়ির দিকে।

কিছুটা এগিয়ে মনে হলো একজন লোক যেন তাকে অনুসরণ করছে।

দীপক বাড়ি ফিরল।

লোকটা তারপর চলল অন্যদিকে।

দীপকও হঠাৎ বেশ পাল্টে লোকটিকে দূর থেকে অনুসরণ করে চলল।

লোকটা চলল রেল স্টেশনের দিকে।

সেখানে গিয়ে দু'জনে লোককে সে যেন ফিস ফিস করে কি বললে।

তার কথা শুনে লোক দু'জন গেল সোজা পার্সেলের ঘরে।

সেখান থেকে তারা বিরাট দুটি কাপড়ের গাঁট বের করে আনল।

দীপক সব দেখল।

তক্ষুনি তার মনে কি যেন সন্দেহ হলো। সে রেল-পুলিসকে সব কথা বলল। তারপর নিজের পরিচয় দিল।

তক্ষুনি তারা এসে বললে—আমরা ঐ কাপড়ের গাঁট দুটি সার্চ করব।

—কেন?

—আমাদের সন্দেহ হচ্ছে।

গাঁট দুটি নাড়তেই তা বেশ ভারী বলে মনে হলো তাদের।

গাঁট দুটি খুলে ফেলা হলো।

আশ্চর্য, কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে দেখা গেল ক'টি পাথরের মূর্তি।

দীপক বললে—ওসব তোমরা কোথায় চালান দিচ্ছ বলো ত?

—আমরা জানি না। জানেন কর্তা।

—তিনি কে?

—তাঁকে কেউ জানে না?

—কোত্থেকে আসছে এগুলো?

—কোলকাতা থেকে।

দীপক দেখল, প্রেরকের নাম হলো একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তার নাম হলো হল্‌ডেন। ঠিকানা পার্ক হোটেল।

দীপক দু'জন লোককে গ্রেপ্তার করল।

॥ নয় ॥

সকাল নটা।

কোলকাতা পুলিসের অপরাধ বিভাগের পুলিস সুপার, শ্রীরণজিৎ মুখার্জী জামসেদপুর থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলেন।

টেলিগ্রাম করেছে দীপক চ্যাটার্জী :

মহাশয়,

আমার এই টেলিগ্রামটি পওয়া মাত্র ৪৭নং পার্ক স্ট্রীটের হোটেল থেকে হল্‌ডেন নামক লোকটিকে গ্রেপ্তার করবেন।

ও হলো ফরাসী নাগারক। বিরাট একটি ক্রিমিন্যাল দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ। ও দীর্ঘদিন ভারতে আছে চোরাই মাল কম দরে কিনে বিদেশে পাচার করার জন্যে।

এই হল্‌ডেন যদি কোনও মাল কোথাও বুক করে থাকে তাও তল্লাসী করবেন। রেলের পার্সেল বিভাগে ও প্লেনের পার্সেল বিভাগ এনকোয়ারি করবেন। বিশেষ জরুরী। ইতি—দীপক।

পুলিস সুপার এই তারটি পাওয়া মাত্রই কাজ শুরু করে দিলেন।

তিনি হল্‌ডেনকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরলেন। তারপর চললেন স্টেশনে।

সেখানে হল্‌ডেন ব্রাদার্স-এর তিনটি বুক করা কাপড়ের গাঁট পাওয়া গেল। তা পাঠান হচ্ছিল বোম্বেতে—জেম্‌স্ নামে একজন লোককে।

এগুলি পরদিন ট্রেনে বুক করার কথা ছিল। সব আটক করা হলো।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোককে সাক্ষী রেখে তাদের সামনে কাপড়ের গাঁটগুলি এক এক করে ক'টি খোলা হলো।

প্রতিটি গাঁট থেকে তিন চারটি করে পাথরের তৈরী মূর্তি বের হলো।

এগুলি চোরাই মূর্তি—নানা স্থান থেকে এই সব মূর্তি চুরি করা হয়েছে।

এদিকে হল্‌ডেন অব্যাহতি পাবার জন্যে বললে—আমি এর কিছুই জানি না। আমার সঙ্গে প্রতারণা করে কাপড়ের গাঁটে পাথর ঢুকিয়েছে। ঠিকাদার কাপড় বাঁচিয়ে তার বদলে পাথর পুরে দিয়েছে।

পুলিস সুপার বললেন—যদি তাই হয়, আপনার কোনও ভয় নেই। ঠিকাদার কে?

—পার্ক সার্কাসের ইসমাইল নামে ঠিকাদার।

—ঠিক আছে।

ঠিকাদারকে গ্রেপ্তার করে আনা হলো তৎক্ষণাৎ।

পুলিস সুপার তাকে প্রশ্ন করলেন—তুমিই কি হল্‌ডেন ব্রাদার্সের মাল বেঁধেছ?

—হ্যাঁ স্যার!

—তুমি কাপড়ের বদলে পাথরের মূর্তি ভরেছ কেন?

—আজ্ঞে হুঁজুর, আমাকে যা বলা হয়েছে তাই ত করেছি।

—ঠিক বলছ?

হ্যাঁ স্যার! বিলকুল ঠিক। এই মূর্তিগুলো ত সাহেব তিনশো চারশো টাকা দিয়ে কিনেছেন। এর দাম নাকি হাজার হাজার টাকা।

—তাই নাকি?

ইসমাইল পুলিস সুপারকে হল্‌ডেনের লেখা কিছু কিছু কাগজ দেখাল।

পুলিস সুপার দেখলেন।

তাতে বিভিন্ন লোকের নাম ও টাকার অংক লেখা আছে।

হল্‌ডেন এবারে ঘাবড়ে গেল। তবে সে এই ভাব কাটিয়ে উঠে বললে—এসব ত কাপড়ওয়ালাদের টাকার হিসাব।

পুলিস সুপার বললেন—কাপড়ওয়ালাদের ঠিকানা কি ?

—তা ত মনে নেই।

—মিথ্যা কথা। এ হলো সেই সব লোক যারা মূর্তি নিয়ে আসত—এনে টাকা নিয়ে গেছে তারা।

—মিথ্যা কথা—আমি মূর্তি কি করবো ?

—তা জানা যাবে নিশ্চয়ই।

ঠিকাদার বললে—মিথ্যা কথা বলছে স্যার। ঐ পাথরের মূর্তি বিদেশে পাঠায় ওরা, মোটা লাভ করে! এক একটা মূর্তির দাম চার পাঁচ হাজার টাকা। আমাকে এখন মিথ্যা বলে জেলে দেবার চেষ্টা করছে। আপনি সাহবকে সার্চ করুন স্যার। তা হলেই সত্য ঘটনা ধরা পড়বে।

—ঠিক কথা।

তক্ষুনি হল্‌ডেনের বাড়ি সার্চ করা হলো।

সে বললে—বিদেশী মার্চেণ্টকে অনর্থক বিরক্ত করলেন—এর ফল পাবেন।

—দেখা যাবে তা।

হল্‌ডেনকে সার্চ করেই মিলল একটা খাম। তা দেখেই ঠিকাদার বললে—স্যার, এই ত সেই খাম। আমি আজ মাল বুক করেছি। ঐ খামেই ত রেলের রসিদ আছে।

সত্যিই তার মধ্যে আর. আর. পাওয়া গেল একটা।

প্রতিটি মালের ওজন লেখা আছে।

পুলিস সুপার বললেন—সাহেব, এত ছোট ছোট বাণ্ডিলের ওজন কি এত হয় ? তুমি নিশ্চয় জানতে এতে শুধু কাপড় নেই—আছে মূর্তি। আচ্ছা, এত মূর্তি বিদেশে কোথায় যায় ?

—জানি না।

—আমি জানি। এই সব মূর্তি চোরাই পথে বিদেশে যায় এবং তা মোটা মূল্যে বিক্রি হয়।

—হতে পারে।

—আপনার কিছু বলার আছে?

—না।

হল্‌ডেনের ফ্ল্যাট সার্চ করে আরও মিলল একটা জিনিস। তা হলো— অপরাধী সংঘের একটা কার্ড।

পুলিস সুপার তক্ষুনি সব কথা দীপককে আর্জেন্ট টেলিফোন করে জানালেন।

আর হল্‌ডেনকে বিচারের জন্য আটক রাখা হলো।

* * *

বোম্বাই।

বেলা এগারোটা।

সেখানকার অপরাধ বিভাগের সুপার মিঃ রামানন্দ একটা তার পেলেন।

এই টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র সিভিল হোটেলে গিয়ে মিঃ জেমস্ নামে এক ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করবেন।

ও হলো হল্‌ডেন ব্রাদার্স—কোলকাতার সঙ্গে জড়িত। ওরা মাল বোম্বে থেকে বিদেশে চালান দেয়। তাতে চোরাই মূর্তি থাকে।

যদি ওর কোনও মাল কোথাও বুক করা থাকে তা সার্চ করুন অবিলম্বে। ইতি—মিঃ মুখার্জী।

পুলিস সুপার, কোলকাতা।

চিঠি পড়েই মিঃ রামানন্দ একদল পুলিস নিয়ে ছুটলেন মিঃ জেমস্‌কে অ্যারেষ্ট করার জন্য।

মিঃ জেমস্ থাকেন সিভিল হোটেলে। পুলিস ঘিরে ফেলে হোটেলটা।

মিঃ জেমস প্রায় পঞ্চাশ-ছাপান্ন বছর বয়সের একজন বুড়ো লোক।

যে সময় মিঃ রামানন্দ তার হোটেলের কামরায় প্রবেশ করলেন, তখন সে মদ্যপান করছিল।

মিঃ রামানন্দ বললেন—আপনার নামই কি মিঃ জেমস্?

—তাতে কি সন্দেহ আছে?

—তা ঠিক নয়।

—তবে? যাক সেকথা ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কি আমি এক পেগ করে অফার করতে পারি?

—আমরা খাই না।

—বেশ, তবে চা বা কফি—

—না। আমরা পুলিসের লোক।

—ও, তাহলে বড্ড ভুল হয়েছে। বলে সে মদের বোতলটা নামিয়ে রাখল।

—আমরা আপনাকে অ্যারেষ্ট করতে এসেছি মিঃ জেমস্।

—অ্যারেষ্ট! কেন? আমি মদ খাই সেই জন্যে নাকি? কিন্তু আমি বদমেজাজের লোক নই। আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

—আপনি মহামূর্খ। আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। সত্যিই অ্যারেষ্ট করতে এসেছি। দেখুন না, দরজায় পুলিস আছে।

—ও, আচ্ছা।

বলে মিঃ জেমস্ গ্লাসের বাকি মদটুকু ঢক্-ঢক্ করে গিলে ফেললেন।

তারপর বললেন—কিন্তু বন্ধুগণ, এটা খারাপ কাজ। আমি পান করেছি বটে, কিন্তু এটা পয়সা দিয়ে কিনেছি। মাতলামি ত কিছু করিনি। তবে কেন গ্রেপ্তার করছেন?

—আপনাকে মদ্যপান করবার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

—তবে? আজ ত পয়লা এপ্রিলও নয় যে ঠাট্টা করবেন।

বলে, বাকি মদটা বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে সে তা শেষ করল।

—আপনাকে এই জন্য গ্রেপ্তার করছি যে আপনি হলেন হল্‌ডেন ব্রাদার্সের সঙ্গে জড়িত। আপনারা নানা ধরনের দামী মূর্তি সস্তায় কিনে বিদেশে পাচার করছেন মোটা টাকায় বিক্রির জন্যে। ভারতের এই সব কলাপূর্ণ মূর্তি কিনে চোরাই পথে বিদেশে চালান দেওয়া হয়। পার্সেলের মাধ্যমে নানা মালের সঙ্গে টাকা এদেশে চলে আসে। আর মূর্তিও এভাবে মালের সঙ্গেই বিদেশে যায়। আপনাদের একটা বিরাট দল আছে—

—আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি।

—আপনাকে আমরা বন্দরে নিয়ে যাব। সেখানে যে-সব মাল আপনারা বিদেশে পাঠাচ্ছেন সব সার্চ করব।

—আচ্ছা বন্ধু, তা করতে হবে না। আমি নেশাখোর, স্মাগলার, কিন্তু মিথ্যাবাদী নই। ঐ সব কাপড়ের গাঁট খুললে প্রতিটিতে একটি করে পাথরের মূর্তি পাওয়া যাবে। এবার খুশী ত? হ্যাঁ, একবার প্রাণ খুলে হাসো তোমরা—হাঃ-হাঃ-হাঃ···

মিঃ রামানন্দ ভাবলেন—লোকটা পাগল বা বুড়ো বয়সে মাথা এমনি হয়েছে!

তিনি বললেন—আপনি ধরা পড়লেন, মনে দুঃখ হচ্ছে না?

—না ?

—কেন ?

—দুনিয়ায় অনেক জেল দেখেছি। এবার ভারতের জেলটা একটু দেখি। এটাই ত হলো আমাদের অবসরের জায়গা।

—আমি দুঃখিত—সরকারী আদেশ পালন করতে হচ্ছে আমাকে।

—না, একথা বলো না। আমি এককালে চুরি-ডাকাতি অনেক করেছি। শাস্তিও পেয়েছি আমি কয়েকবার। সভ্য দেশের লোকেরা অপরাধীকে যথার্থ আদরে রাখে। আর আমার কেউ নেই যে জেলে থাকলে মন খারাপ করবে। আর বউ, সে ত টাকা দিলে নিত্য নতুন মেলে—বিয়ে করা বোকামি। যাক সেকথা, এখন বুড়া হয়েছি। আর সাহস করে চুরি করতে পারি না। তাই অপরাধীদের দলে নাম লিখিয়েছি। স্মাগ্‌লিং করছি।

মিঃ জেম্‌স্ উঠে হাত-মুখ ধুলো। তারপর পরিষ্কার জামা-কাপড় পরল। সব জিনিস আলমারিতে ভরে তালা লাগাল।

রামানন্দকে বললে—ক' মাসের জেল হতে পারে ভাই ?

—ছ' মাস ধরুন।

—ঠিক আছে।

হোটেলওয়ালাকে সে ছ' মাসের বিল অগ্রিম দিয়ে রসিদ নিল। বললে—আমার ঘর যেন এমনি বন্ধ থাকে। কোন মাল যেন সরানো না হয়।

—ঠিক আছে স্যার।

তারপর সে পুলিস ভ্যানে গিয়ে উঠল।

* * *

সেদিন সকালবেলা।

মোহনপুরের একটি গরীব চাষী মহাদেবের মন্দির থেকে আধ মাইল দূরে একটা হীরা কুড়িয়ে পেল।

সে সেটা থানায় জমা দিতে এলো।

খবর পেয়ে মিঃ রামকুমার তক্ষুনি দীপককে খবর দিলেন।

দীপক এলো থানায়।

—কি ব্যাপার ?

—এই লোকটা এই হীরাটি কুড়িয়ে পেয়েছে।

—কোথায় ?

—পুকুরের ধারে।

—এটা কিসের হীরা ?

—মহাকাল মূর্তির গলায় দামী পাথরের তৈরী মহামূল্যবান মালাটি ছিল, এটি তার মধ্যেকার একটি ছোট হীরা।

দীপক চিন্তিত হলো। বললে—অত বড় মূর্তিটা ত সহজে সরানো যাবে না বা বহুদূরে নেওয়া যাবে না।

—না।

—তাই বোধ হয় অপরাধীরা এটা নিয়ে আপাতত ঐ পুকুরে ফেলে রেখেছে। উদ্দেশ্য পরে সুযোগমত পাচার করবে।

—তা হতে পারে।

—তাহলে চলুন একটা কাজ করা যাক।

—কি ?

—পুকুরটা সার্চ করতে হবে। মহাকাল মূর্তিটা ওখানেই মিলতে পারে।

—কিন্তু একটা কথা দীপকবাবু !

—কি ?

—মূর্তিগুলি যারা চুরি করেছে, তারা প্রত্যেকে ত বিদেশী স্মাগ্‌লার কিন্তু এদের দলপতি একজন ভারতীয় আছে নিশ্চয়। সে কে ? সে কোথায় থাকে ?

—দেখা যাক।

দীপক তক্ষুনি ঐ পুকুরটি সার্চ করার জন্যে তৈরী হয়ে রওনা হলো।

* * *

বেলা একটা।

মহাকাল মন্দিরের কাছের সেই পুকুরটা পরিষ্কার করা হতে লাগল।

কয়েকটা পাম্প আনা হলো। জল উঠতে লাগল দ্রুত।

জল পাম্প করে তুলে নলের মাধ্যমে অন্য একটা পুকুরে ফেলা হতে লাগল।

দেখতে দেখতে প্রচুর লোক জমা হয়ে গেল। তারা শুনল এখানেই মূর্তি পাওয়া যাবে।

ধর্মান্ধ লোকের দল পুকুর ঘিরে অপেক্ষা করতে লাগল।

দীপক আর রতন উপস্থিত ছিল সেখানে।

ছিল পুলিস অফিসার রামকুমার আর তার দলবল।

জনতা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আধঘণ্টা পরে।

একসময় দেখা গেল পুকুরের জল একেবারে কমে এসেছে।

চারজন লোক নেমে পড়ল খুঁজতে।

একটু পরেই একজন চীৎকার করে উঠল—এই যে মূর্তি। এতদিনে হারানো মূর্তিটা পাওয়া গেল।

চারজন ধরাধরি করে বিরাট মূর্তিটা টেনে ওপরে নিয়ে এলো। জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল—জয় মহাদেব! জয় মহাকাল!

বিরাট মহাদেবের মূর্তিটা টেনে তোলা হলো ওপরে।

প্রচুর আনন্দের রোল উঠল। জনতা মূর্তিটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে মন্দিরে স্থাপন করল।

সবাই চীৎকার করে উঠল—জয় দীপক চ্যাটার্জীর জয়!

কিন্তু দীপক জানত না, এই কর্মতৎপরতা তার বিপদ ডেকে আনতে পারে।

॥ এগারো ॥

সেই দিনই।

বিকেল পাঁচটা।

দীপক সারাদিনই কাজে খুব ব্যস্ত ছিল।

বিকেল বেলা বাড়ি ফিরল।

ফিরেই দেখল তার নামে একটা চিঠি। কে যেন হাতে লিখে রেখে গেছে চাকরের কাছে।

দীপক চিঠিটা পড়ল।

তাতে লেখা ঃ

মাননীয় দীপকবাবু সমীপেষু—

পত্রপাঠ মাত্র আপনি একবার মহিলা সমিতির অফিসে এসে দেখা করবেন। বিশেষ জরুরী জানবেন।

ইতি—

জয়শ্রী দেবী।

দীপক চিন্তিত হলো।

তন্দ্রাও ওখানে আছে। তার কোন বিপদ হলো না ত? কে জানে।

দীপক রতনকে দেখাল চিঠিটা।

রতন বললে—তুই যাবি, না আমি যাব?

—চল্ দুজনেই যাই।

—বেশ ত।

* * *

দুজনে গিয়ে উপস্থিত হলো মহিলা সমিতির অফিসে।

জয়শ্রী দেবী এগিয়ে এলেন।

—কি খবর ?

—খবর ভাল নয়।

—তার মানে ?

—মানে, মায়া পলায়ন করেছে।

—কি ভাবে ?

—সেটা ত বুঝতে পারছি না। সকালবেলা সে তার ঘরেই ছিল। ঘরের বাইরে অন্য মেয়ে ছিল, সে নজর রেখেছিল। সামনে দিয়ে ও যেতে পারেনি—গেছে পিছন দিকের জানালা দিয়ে।

—জানলায় গরাদ নেই ?

—না।

—তবে ঐ পথ দিয়েই গেছে।

দীপক ভেতরে গেল। সে ঘরে মায়া ছিল তা দেখল।

জানলার গরাদের গায়ে দুটো দাগ দেখা গেল।

হুকের দাগ।

দীপক বললে—এখানে হুক লাগিয়ে দড়ি দিয়ে ঝুলে নীচে নেমে গেছে।

—তা হতে পারে।

—নীচে গিয়ে দড়িটায় টান দিতেই হুকটা আলগা হয়ে গেছে, তখন দড়িশুদ্ধ হুকটা টেনে নিয়েছে।

—কিন্তু এত বুদ্ধি ও পেল কোথায় ?

—অসম্ভব নয়!

—কেন ?

—ও যে দলে মিশত, তারা নেহাত বোকা লোক নয়।

—তা বটে।

দীপক কথা বাড়াল না। চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরল।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মায়ার সন্ধান আর পাওয়া গেল না।

তারপর ক'দিন দীপক কোথায় যে গা-ঢাকা দিয়ে রইলো তা জানা গেল না।

তবে যে ভবঘুরে ভিখিরী শ্রেণীর লোকটিকে ক'দিন ধরে হাটে-বাজারে দেখা গেল ভিক্ষে করতে, সেই যে দীপক তা তাকে দেখে বোঝা যায় না।

সেদিন বেলা বারোটা।

হাটে বসে দীপক ভিক্ষে করছিল।

এমন সময় দেখা গেল একজন লোক এসে ভিক্ষা দিল তাকে।

দীপক লোকটির দিকে তাকাল।

তারপর বললে—দশ পয়সা দিয়ে কি হবে ?

—কেন ?

—আরে ভাই, এক রূপেয়া দেও, দো রূপেয়া মিল যায়গা !

—ক্যায়সে ?

—তোম দেখেগা ?

—আচ্ছা ভাই—

লোকটা একটা টাকা বের করল। দীপক নিমেষে তাকে দু'টাকা করে দিল। দুটি এক টাকার নোট।

লোকটা অবাক হয়ে গেল। সে তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট বের করল। দীপক মন্ত্র পড়ে তাকে দুটি পাঁচ টাকার নোট করে দিল।

লোকটা বললে—যদি আরও টাকা আনি ?

—সব হবে। কিন্তু টাকা পাবি কোথায় ?

—বাবুর আলমারি থেকে চুরি করে আনব। ডবল করে নিয়ে আবার রেখে আসব।

—তোর বাবুর বহুৎ টাকা—না ?

—হ্যাঁ জী।

—এত টাকা পায় কোথায় ?

—বহুৎ বড় কারবার।

—কিসের কারবার ?

—বাবুর বাড়ির নীচের তলায় পাতালপুরী আছে। তাতে থাকে কত শত পাথরের মূর্তি। ওসব বিদেশে চালান যায়। লাখ লাখ টাকা আসে।

দীপক কানে কানে কি যেন বললে।

লোকটা তা শুনে কথাটির উত্তর দিলে।

দীপক বললে—ঠিক আছে, পরে হবে।

—আচ্ছা।

লোকটা চলে গেল।

দীপক চিন্তা করতে লাগল।

দীপক জানে, যে জাল সে পেতেছে তা সফল হবে কিনা তা সে বুঝতে পারল না। তবে আশান্বিত হলো সে।

॥ বারো ॥

পরদিন সকাল।

দীপক উপস্থিত হলো থানায়।

মিঃ রামকুমার তাকে অভ্যর্থনা জানালেন—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী।

—নমস্কার! বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

—কি রকম?

—আপনাকে এক্ষুণি একটা সার্চ ওয়ারেণ্ট বের করতে হবে।

—কার নামে?

দীপক তার কানে ফিস-ফিস্ করে কি যেন বললে। তা শুনে চমকে উঠলেন রামকুমার—বলেন কি?

—হ্যাঁ।

—এ অসম্ভব।

—কেন?

—বিনা প্রমাণে এমন লোকের নামে কোন ওয়ারেণ্ট হতে পারে না।

—নিশ্চয় পারে।

—না। এর কৈফিয়ৎ কে দেবে?

—আমি দেব।

—তবু এত বড় দায়িত্ব আমি নিতে পারব না দীপকবাবু।

—কেন?

—আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে—যদি প্রমাণ করতে না পারেন।

—নিশ্চয় পারব।

রামকুমার কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন। তারপর বললেন—একটা কথা—

—বলুন।

—একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। তাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।

—ক রকম?

রামকুমার প্ল্যানটা খুলে বললেন।

দীপক বললে—মন্দ নয় প্ল্যানটা।

—তবে তাই করুন।

—বেশ ত।

—কখন যাবেন?

—কাল সকালে।

—ঠিক আছে! রতনবাবুকে আপনি বলে রাখবেন!

—আচ্ছা।

দীপক উঠে দাঁড়াল।

* * *

মোহনপুরের বিখ্যাত ধনী শেঠ মোহনলাল।

পরদিন সকালবেলা দীপক আর মিঃ রামকুমার তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে রতন।

মিঃ রামকুমার বললেন—কি রকম আছেন স্যার? শরীর ভাল ত?

—হ্যাঁ, অনেকটা ভাল।

—হার্টের ট্রাবল কি কমেছে?

—কিছুটা।

রতনকে দেখিয়ে মিঃ রামকুমার বললেন—ইনি হলেন বিখ্যাত হার্ট-স্পেশালিষ্ট। ইনি আপনাকে দেখতে চান।

—বেশ ত।

রতন বুক পরীক্ষা করতে লাগল।

এই অবসরে দীপক গেল পাশের করিডরে।

সেখানে কেউ ছিল না।

করিডর পেরিয়ে দীপক গেল একটা গুদামঘরে।

সেই ঘরটি পার হয়ে আর একটা ঘর। তাতে অনেক পুরানো জিনিসপত্র এককোণে জড়ো করা। তার পাশে একটা আলমারি।

দীপকের সন্দেহ হলো।

সে ভাবতে লাগল, আলমারিটা দেওয়ালের সঙ্গে না রেখে দু'হাত ফাঁক করে রেখেছে কেন?

সে দেখল, আলমারির পেছনে একজন লোক খুব সহজেই ঢুকতে পারে!

দীপক চলে গেল আলমারির পেছনে।

সেখানে গিয়ে দেখল দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট সরু ফাটল।

ফাটলের পাশে একটা ছোট সুইচ।

দীপক সুইচে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ফাটলটা সরে গেল। দেখা গেল একটা ভূগর্ভ পথ।

সেই পথে ছিল সারি সারি সিঁড়ি! সিঁড়িটা অন্ধকারময়।

দীপক সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল। তার মন আনন্দে ভরে উঠল।

দীপক সিঁড়িতে আলো ফেলে নামতে লাগল। যেখানে সিঁড়ি শেষ হয়েছে সেখানে একটা সুন্দর ঘর।

দেওয়ালে ছিল ইলেকট্রিক সুইচ।

সুইচ টিপতেই ঘরটা আলোয় ভরে উঠল যেন।

সেই আলোয় দীপক যা দেখতে পেল তাতে তার মন আনন্দে ভরে উঠল। দেখল, সেই ঘরে অনেকগুলি প্রাচীন আমলের পাথরের মূর্তি। সেই ঘরটা যেন একটা মূর্তির সংগ্রহশালা। প্রতিটি মূর্তিই খুব সুন্দর। ভারতীয় কলার সাক্ষ্য বহন করছে সেগুলো।

সেই মূর্তিগুলির মাঝে একটাকে দীপক চিনতে পারল। গত বছর সেটা কলকাতা মিউজিয়াম থেকে চুরি গিয়েছিল। পুলিস শত চেষ্টা করেও চোরকে ধরতে পারেনি।

হঠাৎ পেছনে শোনা গেল শব্দ।

সে বুঝল, শেঠ মোহনলালের লোক টের পেয়েছে। তাই রাইফেল নিয়ে এসেছে দীপককে শেষ করতে।

মোহনলালের ছেলে লছমন এদের দলের একজন পাণ্ডা, তা সে বুঝতে পেরেছিল।

দীপক চট করে একটা মূর্তির পাশে সরে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল থেকে গুলি ছুটে এলো—গুড়ুম! গুড়ুম!

দীপক সরে গেল বলে গুলি তার গায়ে লাগল না, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দীপক তখন পিস্তল বের করে পাল্টা ফায়ার করল।

বারুদের গন্ধে সারা ঘর ভরে গেল।

॥ তেরো ॥

এদিকে মিঃ রামকুমারও পিস্তলের শব্দটা শুনতে পেলেন।

তিনি বুঝতে পারলেন নিশ্চয় কিছু ঘটেছে—দীপক যা অনুমান করেছে তা ঠিক।

তিনি তক্ষুনি তাঁর হুইসেলে ফু দিলেন।

বাইরে কিছু দূরে পুলিসবাহিনী অপেক্ষা করছিল ছদ্মবেশে।

তারা সদলে ভেতরে প্রবেশ করল।

মিঃ রামকুমার শেঠ মোহনলালের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

বিস্মিত হলেন শেঠ মোহনলাল—বললেন—এ কি ব্যাপার?

—জানেন না কিছু?

—না ত!

আপনি হলেন বিরাট একটা আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল দলের মাথা। আপনার দলের নাম হলো 'অপরাধী সংঘ।'

—মিথ্যা কথা।

—মিথ্যা নয়, সব প্রমাণ আমরা দেখাবো।

দুজন পুলিসের জিম্মায় তাঁকে রেখে শব্দ লক্ষ্য করে পুলিস-দল ও মিঃ রামকুমার এগিয়ে চললেন।

এদিকে লছমন দীপকের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করতে প্রস্তুত হলো, কিন্তু হঠাৎ পুলিস দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

দেখে একদল পুলিস পেছনদিক থেকে এগিয়ে আসছে।

সে সোজা পালিয়ে গেল সেখান থেকে ডানদিকের আর এক ভঙ্গ-পথ ধরে।

তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

পুলিসবাহিনী মোহনলাল ও তার দলের চার পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল।

* * *

সামনে অফুরন্ত নীল সমুদ্র।

নিবিড় নীলিমা। তার মাঝে অন্য কিছু দেখা যায় না।

ঢেউ ভেঙে জাহাজটা এগিয়ে চলেছে। বোম্বে থেকে ছেড়েছে—সেটা চলে যাবে সোজা ভারতের বাইরে।

জাহাজের একটা কেবিনে দেখা গেল দুজন লোককে—একটি পুরুষ ও একটি নারী।

লছমন আর মায়া।

দুজনের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। মায়া লছমনের নির্দেশেই কাজ করত।

আজ দুজনই পলাতক।

মায়া বললে—কোথায় চলেছ তা ত বললে না?

—সোজা ওডেন। সেখান-থেকে ইতালী বা ফ্রান্সে যাব।

—দেশে ফিরবে না?

—না।

—চলবে কি করে?

—তিন লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তা ছাড়া প্রচুর টাকা বিদেশে পাওনা আছে। ঐ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করব।

—তা ভাল। কিন্তু তুমি কেন এই অসৎ-পথকেই জীবনে বেছে নিলে? সৎ-পথে থাকলে চলত না?

আমার বাবাকে দেখলাম—সামান্য গরীব অবস্থা থেকে ওই পথে গতি করতে। সেটাই শিখে নিলাম জীবনে।

গল্প করনি। আজ ত বুঝতে পারছ!

লছমন কিছু বললে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু।

জাহাজে ডিনারের ঘণ্টা পড়ল।

খেতে গেল ওরা দুজন ডাইনিং রুমে।

ফিরল আধ ঘণ্টা পরে।

এসে দেখে সারা ঘর লণ্ডভণ্ড। মালপত্র সব তছনছ।

লছমন অবাক হলো।

মালপত্রের এ অবস্থা করলে কে? কে সব ঘেঁটেছে এভাবে?

লছমন ডাক দিল—মায়া!

—কি?

—দীপকবাবু কি জাহাজে আছে?

—কেন?

—দেখছ না, টাকা পয়সা কিছুই হারায়নি, অথচ—

—অথচ কি?

—আমার ডায়েরী উধাও। চোর ঐ ডায়েরী নিয়ে কি করবে?

—তাই ত!

ওরা ভীত হলো।

—কি করা যায়? মায়া বললে।

—ক্যাপ্টনকে খবর দেব?

—তাতে লাভ নেই।

—তা বটে।

এমন সময় হঠাৎ খট-খট করে দরজায় কে যেন টোকা দিল।

দরজা খুলে দিল লছমন।

—কাকে চান?

—আমি পাশের কেবিনে থাকি।

—তা জানি।

—আমার ঘরের সব মালপত্র কে নাড়াচাড়া করেছে?

—তার মানে? আপনি কি বলতে চান? আমার এই ঘরেও ত চোর এসেছিল!

—আপনার ঘরে?

—হ্যাঁ।

—আমার ঘরে চলুন। গিয়ে সব দেখে আসবেন চলুন।

লছমন গিয়ে দেখে সত্যিই ঐ ভদ্রলোকের ঘরে চোর ঢুকে সব তছনছ করেছে।

—আপনার নাম?

—বীরেশ রায়।

—নমস্কার। কিছু মনে করবেন না। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে চোর আপনার ঘরেও···

—তা বটে। এর জন্যে মনে করার কিছু নেই।

লছমন বেরিয়ে যায়।

* * *

পরদিন ভোরবেলা।

জাহাজের বাঁশী বাজল।

সবাই ভাবল, জাহাজ বোধ হয় এখানে নোঙ্গর ফেলবে।

কিন্তু একি!

জাহাজ যে ঘুরে এসেছে বোম্বে বন্দরেই!

লছমন অবাক!

একি! মায়া!

তাই ত! কি করি!

লছমন দেখে, দলে দলে পুলিস দল জাহাজকে ঘিরে ফেলেছে।

লছমন বললে—উঃ, শেষ পর্যন্ত পালাতে পারলাম না। শাস্তি পেতেই হবে।

—তাই দেখছি।

পুলিস এসে ওদের গ্রেপ্তার করল।

এমন সময় বীরেশ রায় বেরিয়ে এলো।

পুলিস অফিসার তাকে স্যালুট করল।

লছমন বললে—উনি কে?

—উনিই ত দীপকবাবু।

—আশ্চর্য!

লছমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

*　　*　　*

আদালতের বিচারে লছমন ও মোহনলালের কারাদণ্ডের খবর কাগজে বের হয়েছিল।

মায়া এবং দলের অন্যান্যদেরও অল্প মেয়াদী কারাদণ্ড হলো।

ভারত থেকে অপরাধী সংঘের নাম চিরতরে মুছে গেল।

॥ শেষ ॥

মুদ্রাকর :—সতীশচন্দ্র সিকদার "বন্দনা ইম্প্রেশন (প্রাঃ) লিঃ"
৭এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

বন্দী লেখক,

ত্যর যাদুকর

ওঁক! মায়া!

ইত! কি করি!

রচিত

লছ..ন দেখে, দলে দলে পুলিস দল ও শ্বাস-রুদ্ধকারী আতংক!

লছমন বললে—উঃ, শেষ পর্ব শেষ পাতা পর্যন্ত এক-নিঃশ্বাসে না পড়ে ছাড়বে। রহস্য উপন্যাস জগতের অভিনব বিস্ময়।

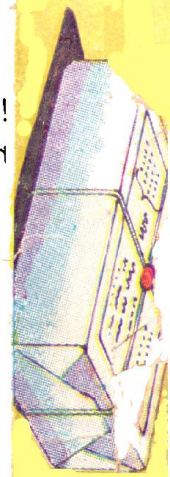

সি. আই. ডি. সিরিজ

১। ছত্রপতির তলোয়ার
২। অপরাধী সম্রাট
৩। দস্যুরাজের ষড়যন্ত্র
৪। প্রাণ নিয়ে খেলা
৫। মিস্ট্রি গার্ল
৬। আঁধার রাতের যাত্রী
৭। গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব
৮। হীরার লকেটের রহস্য
৯। অজানা পার্শ্বেলের রহস্য
১০। নীল সাগরের আতংক

কালনাগিনী সিরিজ

১। দস্যু-নেত্রী কালনাগিনী
২। কালনাগিনীর অভিযান
৩। কালনাগিনীর বিভীষিকা
৪। কালনাগিনীর মারণ-উৎসব
৫। সবুজ দ্বীপে কালনাগিনী
৬। মৃত্যুচক্রে কালনাগিনী
৭। কালনাগিনীর রহস্যজাল
৮। কালনাগিনীর ষড়যন্ত্র
৯। কালনাগিনীর প্রতিহিংসা
১০। চীন সীমান্তে কালনাগিনী
১১। সাগরতলে কালনাগিনী
১২। ফাঁসির মঞ্চে কালনাগিনী
১৩। কালনাগিনীর রণ-হুংকার
১৪। আর্ত-ত্রাণে কালনাগিনী
১৫। কালনাগিনী ও দস্যু-মোহন
১৬। দিগ্বিজয়ী কালনাগিনী
১৭। মহাশূন্যে কালনাগিনী
১৮। আন্দামানে কালনাগিনী
১৯। মায়াবিনী কালনাগিনী
২০। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে কালনাগিনী

এর পর উপরোক্ত দুই সিরিজের বই আরও বের হচ্ছে

৬